আরব্য রজনীর পূর্বকথা

শিবনারায়ণ রায়

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

বাল্যাবস্থায় যখন একখণ্ডে সচিত্র আরব্যোপন্যাস উপহার পাই তখন ধারণা মাত্র ছিল না আরব দেশটাই বা কোথায়, উপন্যাস কাকে বলে, অথবা যা পড়ছি তা আসলি কিতাবের নিতান্তই কাটছাঁট দেওয়া শিশুপাঠ্য কতখানি রূপান্তর, কিংবা মূল কাহিনীমালার রং-রস-আবেদনের কতটা তা থেকে ছেঁকে বার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে বয়সে তাতে কি আসে যায়। সেই উড়ন্ত আসন, শিশি থেকে ধোঁয়ার আকারে বেরিয়ে মহাবলী জিন, সৌভাগ্যবান আলাদিনের যাদু-প্রদীপ, সেই আধাগাঁইয়া আলিবাবা আর শাণিতবুদ্ধি মনোহারিণী মর্জিনা বালকচিত্তকে এক আশ্চর্য জগতে নিয়ে গিয়েছিল যা রামায়ণ-মহাভারতের জগতের থেকে একেবারেই আলাদা, সে যেন অন্য কোনো এক জন্মান্তরের কাহিনী। কাশীরাম-কৃত্তিবাসের জগতে আমার মা-বাবা, আত্মীয় - স্বজনকে কোনোভাবে যদি বা জায়গা দেওয়া যেতো, আরব্য - রজনীর জগতে তারা একেবারেই বেমানান।

বয়স বাড়ল, লাইব্রেরিতে পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম মধ্য প্রাচ্যের কথা, মানচিত্রের সূত্রে পরিচয় ঘটল আমাদের গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, রোমের টাইবার, জার্মানির রাইন--এর মত ইতিহাসের মহাস্রোতবাহিনী সেই দুই অপরূপা নদী--টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস-এর সঙ্গে। এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে সেই শ্যামল উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল সম্ভবত পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা সুমার। সভ্যতাকে ধবংস করে এল অক্কাদ--যারা পালিয়ে বাঁচল তারা স্বতন্ত্রভা বেগড়ে তুলেছিলো উর্ নগর, চাঁদ তাদের দেবতা। তারপর এল ব্যাবিলন -- এখন থেকে চার হাজার বছর আগে ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির প্রঘোষিত সেই বিখ্যাত সুসভ্য "কোড" আজো বিস্ময় জাগায়। তারপর ব্যাবিলনকে হঠিয়ে এলো আসিরিয়্যানরা -- সেও প্রায় তিন হাজার বছর আগের ঘটনা। ইতিহাসে পরিবর্তন বারে বারেই ঘটে, কিন্তুঅতীত ধ্যানধারণা আচার - প্রকরণের অনেকটাই রদবদলের ফাঁকে ফাঁকে টিঁকে যায়। ভারতের দিকে চাইলেই তোএটা নিতান্ত প্রত্যক্ষ। কোথায় সেই পাঁচ হাজার বছর আগেকার সিন্ধু সভ্যতায় লিঙ্গ আর যোনির ব্যাপক চর্চা। আরকোথায় বাঙালি গ্রাম্য-কুমারীর মাটি ছেনে শিব-লিঙ্গের মাথায় বিল্বপত্র চড়ানো। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অনেক ওঠাপড়া দেখেছে, তার কিছুই একেবারে মুছে যায় নি।

এই পটভূমি স্মরণ করবার প্রথম কারণ আরব্য-রজনী নামে যে মহাগ্রন্থটি এখন আমাদের বৈশ্বিক উত্তরাধিকার তারউৎস-উপদানাদি ইসলাম ধর্মের অভ্যুত্থানের চাইতে বহু ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রাচীন এবং বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিকথেকে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ বিশ্বিশ্রুত যে বাঘদাদ শহরের সমূল উচ্ছেদে মার্কিন দেশের বর্তমান প্রায়োন্মাদ প্রেসিডেন্টটি কৃতসংকল্প, সেই বাঘদাদেই আমরা এই অত্যাশ্চর্য সংকলনটির আদি রূপের প্রথম উল্লেখ পাই। কিন্তু সে প্রসঙ্গে কিছুটা পরে আসা যাবে।

অন্য প্রাচীন সভ্যতাদের তুলনায় রোমের সভ্যতা কিছুটা দেরিতে গড়ে ওঠে, কিন্তু ইয়োরোপ এবং এশিয়ার বেশ কিছু

অংশ তার দখলে আনতে পারার ফলে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব একসময়ে বহু বিস্তৃত হয়। প্রাচীন গ্রীস এবং গ্রীস প্রভাবিত রোমের এই সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের যুগকে পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা "ক্ল্যাসিক্যাল" আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু প্রাচীনতর সভ্যতাদের মত এ - সভ্যতাও শেষ পর্যন্ত টেঁকে নি। বর্বর ভিসিগথরা ইউরোপের অনেকাংশ দখল করে ৪১০ খ্রিষ্টাব্দে রোম শহর আক্রমণ করে এবং তিন দিনের লুঠতরাজে এই ঐশ্বর্যশালী রাজধানীটিকে একেবারে প্রায় অপধবস্ত করে দিয়ে যায়। তার আগেই তার গ্রীক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রগুলি---আথেন্স, করিন্থ, স্পার্টা-কে উৎসাদিতকরেছিল। এরপর ইয়োরোপে দীর্ঘ অন্ধকার যুগ শু হয়ে। তারা আগেই ২৯৩ খ্রিস্টাব্দে রোম্যান সাম্রাজ্য দুভাগ হয়ে গিয়েছিল; পশ্চিমাংশের রাজধানী ছিল রোম ; পূর্বাংশের রাজধানী কনস্টানটিনোপল (আগে নাম ছিল বাইজানিয়াম)। কিন্তু রোমের পতনের পর সভ্যতার কেন্দ্র এখন আর পশ্চিমমুখী রইলো না। তারপর ষষ্ঠ শতাব্দীতে এশিয়ার ইতিহাসে অল্প সময়ের মধ্যে এক মহাবিপ্লব ঘটল। আরব নিতান্তই মভূমির দেশ; সেখানে বসবাসী গোষ্ঠীদের মধ্যে বিরোধ লেগেই ছিল; তাদের দেবদেবীরাও সংখ্যক কম নয়; মক্কার পুণ্যস্থান কাবায় তিনশ ষাট জন দেবদেবীর নিবাস। এখন ইতিহাসের কোনো রহস্যময় সূত্রে মক্কার কোরেশী গোষ্ঠীর একজন--- মহম্মদ (৫৭০-৬৩২)--চল্লিশবছরে পৌঁছে হিরা পর্বতের গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় প্রত্যাদেশ পেলেন, যে বিশ্বের স্রষ্টা এবং রক্ষাকর্তা একজনই-- সেই একম্ অদ্বিতীয়ম্ ব্যক্তিটি হচেছন আল্লা-- তিনি তাঁর দূত জিব্রাইলের মারফৎ যা নির্দেশ তাই প্রমাণ্য নিত্য সত্য,এবং সেইসব নির্দেশ প্রকাশ করবার জন্য তিনি নির্বাচন করেছেন মহম্মদকে তাঁর রসুল (বার্তাবহ) বা নবি রূপে। মহম্মদ নিজে সম্ভবত লেখাপড়ার কোনো সুযোগ পান নি (তাঁর বাবা আবদুল্লা পুত্রের জন্মের আগেই মারা যান, মা'রমৃত্যুর সময়ে তাঁর মাত্র ছ'বছর বয়স, বারো বছর বয়স থেকেই তাঁকে ক্যারাভানের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়), কিন্তু অসামান্য তাঁর সহজাত মেধা এবং স্মৃতি শক্তি। বিশ্বাসীদের দৃঢ় ধারণা যে জিব্রাইল তাঁকে দিয়ে বারবার আবৃত্তিকরিয়ে কোরানের সুরাগুলি সব মুখস্থ করান। জিব্রাইল-এর মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করে মহম্মদ এই সুরাগুলি অপরদের গোচর করেন। বিশ্বাসীদের ধারণা মূল কোরানের একটিই মাত্র কপি আছে বেহেস্তে। যে কোরান আমরা জানি তা স্বয়ং আল্লার উক্তি-- জিব্রাইলের সূত্র আলালর নির্বাচিত রসুললের মুখ দিয়ে তা বিশ্ব প্রচারিত। কিন্তু মহম্মদ নিজে কিছু লেখেন নি, তাঁর মুখ থেকে শুনে যে অনুগামীরা লিখেছিলে, তাঁদের লেখায় কিছু কিছু গরমিল ছিল। যে কোরনান এখন সর্বত্র প্রচলিত সেই মুসলিম জগতে প্রামাণ্য কপি বলে গৃহীত হয় খলিফা উথমানের (৬৪৪-৫৬) সময়ে--অন্য সব বিকল্প কপি পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত আধা-ইতিহাস আধা - পুরাণকথার খুব একটা অভিনবত্ব নেই। কিন্ত তার পর এক শতকের মধ্যে যা ঘটল তা প্রায় তুলনা বিহীন। একদা স্বভূমি থেকে বিতাড়িত মহম্মদ কোরানের সূত্রে সুস্পষ্ট রূপ দিলেন শুধু একটি ধর্মীয়প্রত্যয়তন্ত্রের নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিত্য জীবনচর্যার নির্দিষ্ট বিধি নিষেধের। গড়ে তুললেন শুধু একটি বিশ্বাসী অনুচর দল নয়, একটি বহুগোষ্ঠিক কৌম, বিভক্ত আরব গোষ্ঠীগুলিকে দিয়ে গেলেন একটি জাতিগত ঐক্যের বোধ। কোরানের ভাষা হয়ে উঠল সমগ্র আরবের ভাষা, পরে সমগ্র ইসলামের প্রধান ভাষা। আর তিনি সঞ্চার করলেন তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এক প্রবল প্রসারের শক্তি-- যা একদিকে ইসলামের বিশ্বাস এবং আচরণকে যেমন দিকে দিকে সম্প্রসারিতকরলো, তেমনি বিভিন্ন দেশ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামকে মিশিয়ে এমন এক আরব সভ্যতা গড়ে তুললো যাকে বলা যায় ইয়োরোপীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ আর আধুনিক যুগের মধ্যে উজ্জ্বলতম সেতুবন্ধ। আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে না অশিক্ষিত মৌলবাদী মুসলমান না অর্ধশিক্ষিত মৌলবাদী হিন্দু আরব সভ্যতার এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত।

মহম্মদ মারা যান ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে। তিনি বিজয়ী রূপে মদিনায় এসেছিলেন ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে। তখন থেকে হেজিরা সাল শু। তার অল্প সময়ের মধ্যে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বেশিটাই এবং পারস্য বা ইরান সাম্রাজ্যের প্রায় সবটাই ইসলামের অধীনে আসে। এক শতকের মধ্যে ইসলামের প্রেরণায় আরবরা জয় করে উত্তর আফ্রিকার অনেকটা। সেখান থেকে স্পেইন এবং ফ্রান্সের কিছু অংশ। শতাব্দী শেষ হবার আগেই ইসলাম-উজ্জীবিত আরব তার প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করে উত্তরে পীরোনিজ থেকে দক্ষিণে পামির পর্যন্ত -- তার আত্ততার অধ্যে আসে ইজিপ্ত, টাউরাস পর্বতমালার দক্ষিণে বাইজানটাইন সাম্রাজ্য--- আর অবশেষে তা পৌঁছয় ভাতরবর্ষে এবং পরে মালয়েশিয়া - ইন্দোনেশিয়ায়। মহম্মদের মৃত্যুর মাত্র

একশো বছরের ভিতরে কাস্পিয়ান থেকে নীল নদ, অক্সস থেকে পীরেনিজ-- ইউরো - এশিয়া - আফ্রিকার এই বিরাট ভূখণ্ডই ইসলামের আয়ত্তাধীনে আসে। এত অল্পসময়ে এমন বিস্তার আর কোনোধর্মের বা মতবাদের ঘটেনি-- এমন কি অ ামাদের সময়ে বিরাট ক্ষমতা এবং নিরন্তর প্রচার সত্ত্বেও লেলিন-স্ট্যালিনেরআগ্রাসী বলশেভিজ্‌ম্ পর্যন্ত নয়।

।। দুই ।।

কিন্তু ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সমস্যাও দেখা দিল। ধর্মবিশ্বাসী মুসলমানরা রসুলের পূর্ববর্তী যুগকে অন্ধকার যুগ (জাহিলিয় াহ্) বললেও তাতো সত্যিই একেবারে অন্ধকার ছিল না। টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিসকে অবলম্বন করে একটির পর একটি যে সব বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-- আগেই তাদের কিছু কিছু উল্লেখ করেছি-- তারা তাদের সংস্কৃতির এবং ধ্যানধারণ ার যা ভগ্নাবশেষ রেখে গিয়েছিল তাতো অবহেলার মতো নয়। তার চাইতেও বড় কথা ইসলাম ছড়িয়ে পড়বার পর বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এলো যারা রাষ্ট্রিক হিসাবে দুর্বল হলেও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে মহাসমৃদ্ধ। ভারত থেকে এলো দ ার্শনিকেরা, গণিতজ্ঞরা, পারস্য থেকে কবিরা, সাধকরা, মরমীরা, অধিকৃত ইয়োরোপ থেকে ক্ল্যাসিক্যাল সভ্যতার বিচিত্র অবদান। ফলে পাশাপাশি গড়ে উঠল দুই স্তরের ইসলামী সংস্কৃতি-- একটির কেন্দ্র কোরান এবং ধর্মবিশ্বাস--- অন্যটিতে ন ানা সভ্যতা - সংস্কৃতির ফলবন্দ মিশেল যাতে ধর্মের চাইতে প্রাধান্য পেল রূপবোধ, যুক্তিজিজ্ঞসা, বৈচিত্র্যচেতনা, নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা ও উদ্‌ভাবনা।

ইসলামের যেটি বলা হয় সব চাইতে গৌরবোজ্জ্বল যুগ সেটি ছিল ইসলামের উদার আবহাওয়ায় আরব নেতৃত্বে বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক উপাদানের সম্মেলন এবং সংবর্ধনের যুগে। মহম্মদের পরবর্তী চারজন খালিফ (৬৩২-৬৬১) ছিলেন মে াটামুটি গোঁড়া প্রকৃতির-- নতুন ধর্মীয় কৌমকে সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী করবার জন্য হয়তো কড়াকড়ির দরকার ছিল। তাঁদের পর যে উমাইয়দ বংশ (৬৬১-৭৫০) রাজত্ব করে তারা ধর্মীয় গোঁড়ামির চাইতে আরব্য পরিচয়কেই বেশি প্রাধান্য দেয়। যে সব দেশ তারা জয় করে সেখানকার নানা শ্রেষ্ঠ কীর্তিকে তারা আরব কৌমের অন্তর্ভূক্তকরে। গ্রীক ক্ল্যাসিক্‌স্-এর আরবিতে অনুবাদ শু হয়। বিভিন্ন দেশের স্থাপত্যরীতি ব্যাপক প্রভাব ফেলে। উমাইয়দবংশকে সরিয়ে যখন আব্‌বাসিদ বংশ (৭৫০-১২৫৮) প্রতিষ্ঠিত হল ততদিনে ইসলাম দেশদেশান্তরে ছড়িয়েছে, এবং ধর্মের ব্যাপারে গোঁড়ামি থাকলেও যে-সংস্কৃতি গড়ে উঠছে সে যুগের হিসেবে তাকে বিশ্বনাগরিক বলা চলে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টি সাহেবের মতে ইসলাম এবং আরব্য সভ্যতা যখন ইজিপ্ত এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে স্পেনে,কাস্পিয়ান থেকে ভারত সীমান্তে ছড়িয়ে গেল তখন এই বিরাট এবং বিস্তারশীল কৌমের অনেকেই আর খলিফানেতাদের প্রধান ধর্মীয় নেতা বলে স্বীকার করল না। ফলে ওপরে ধর্মের একটা আবরণ থাকলেও বিকাশশীল আরব সভ্যতার বিচিত্র, এমনকি আপাত দৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী, অনেক উপাদানই আশ্রয় পেল। মরমীপন্থী সুফীদের পাশাপাশি যুক্তিবাদী মুতাজিলারা কোরানের প্রাধিকার নিয়ে পর্যন্ত প্রশ্ন তুলতে লাগলেন।

খালিফফ আবু - এল - আববাস (৭৫০-৫৪) যখন ক্ষমতা দখল করে আববাসিদ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁর বংশধরদের সময়ে কী কাণ্ডকারখানা ঘটবে। উমাইদদের রাজধানী ছিল দামাস্কাস। আববাসিদদের মনে হল তাদের এই তিন মহদেশে বিস্তৃত কৌমের উপযোগী নতুন রাজধানী গড়া দরকার, আর টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস উপত্যকার চাইতে উৎকৃষ্ট স্থান কোথায় মিলবে। বংশের প্রতিষ্ঠাতা আববাসের ভাই আবু জাফর (৭৫৪-৭৫) ভাইয়ের উত্তরাধিকারী হয়ে উপাধি নিলেন আবদাল্লা আল-মনসুর, আর তাঁর মহত্তম কীর্তি হল বাঘ্‌দাদ নগরী। টাইগ্রিস উপত্য াকাকে তিনি শুধু অতীতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের কথা ভেবে বাছেন নি ; তিনি হিসেব করেছিলেন এই নতুন রাজধানীর অবস্থান হল এমন ক্ষেত্রে যেখান থেকে যেমন সিরিয়া, আর্মেনিয়া ইত্যাদির কাছে দেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য আনা সহজ তেমনি সুদূর চীন পর্যন্ত ব্যবসাবাণিজ্যে বিস্তার সম্ভবপর। বাঘ্‌দাদ শহর প্রতিষ্ঠা হয় ৭৬২ সালে। গড়ে তুলতে লাগল চার বছর, ব্যয় হয় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ দারহাম, এক লক্ষের বেশি স্থপতি, কারিগর, মজুর ছিল এর রচয়িতা। টাইগ্রিসের পশ্চি মতীরে অবস্থিত এই গোলাকার রাজধানীর বাইরেটা ঘিরে ছিল গভীর পরিখা উঁচু প্রাকারের ঘের দেওয়া নগরের চ ারদিকে পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে চারটি বিরাট সিংহদ্বার--সেখান থেকে চারটি সুসম্পন্ন বিস্তৃত রাজপথ সাম্রাজ্যের

দিকে দিকে প্রসারিত।

অষ্টম শতকে মহা ঐর্শ্বযশালী বাঘ্দাদ হয়ে ওঠে সে যুগের শ্রেষ্ঠনগরী। তার বড় মনোজ্ঞ বর্ণনা রেখে গেছেন আল-আফগানি। শহরে তিন ভাগের একভাগ জুড়ে বাদশাহের প্রাসাদ-- বিরাট বিরাট অট্টালিকা, একদিকে যেমন অফুরন্তবিলাস ব্যসনের সমারোহ, অন্যদিকে তেমনি দেশদেশান্তর থেকে জ্ঞানীগুণী, শিল্পী-কারিগর, ব্যবসায়ী এবং বৈজ্ঞানিকদের সমাগম। আববাসিদ বংশের সব চাইতে বিখ্যাত খালিফ হাণ আল-রশিদ (৭৬৮-৮০৯) ছিলেন "পবিত্র" রোম্যান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট শার্লমেনের (৮০০-৮১৪) সমসাময়িক। শার্লমেন চেষ্টা করেছিলেন ইউরোপে সভ্যতার উজ্জীবন ঘটাতে, রাষ্ট্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে। দুই সম্রাটের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তৎকালীন বিবরণ থেকে খুবই স্পষ্ট যে হাণের সময়কার আরব সভ্যতার তুলনায় শার্লমেনের ইউরোপ ছিল অনেকবেশি দরিদ্র, বিভক্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। তাছাড়া শার্লমেনের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তার সমস্ত নির্মাণ-প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে তার বংশধরদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ শু হয়ে যায়। অপরপক্ষে আরব সভ্যতার স্বর্ণ যুগ সে তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘস্থায়ী । তার পত্তন ঘটে ১২৫৮ সালে দুর্দান্ত আগ্রাসী মঙ্গোলদের আক্রমণের ফলে।

ইতিহাসের বিবর্তনে আরবদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করে অধ্যাপক হিট্টি সঙ্গত কারণেইর সিন্ধান্তে এসেছেন The Arabic speaking peoples were the main bearers of the torch of culture and civilization throughout the world, the medium through which ancient science and philosophy were rediscovered. Supplemented and transmitted to make possible the renaissance of Western Europe... Kindled by contact with Arab thought and quickened by fresh acquatance with ancient Greek lore the interest of Europeans in scholarship and philosophy led them rapidly on to an independent intellectual life of their own whose fruits we still enjoy.

কিন্তু শুধু তো গ্রীসের উত্তরাধিকার নয়, ভারত, মিশর, পাতরস্য, চীনও স্বর্ণযুগের এই আরব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং আরব সভ্যতার সূত্রে ইউরোপে প্রভাব ফেলে। আমরা জানি যে বাঘ্দাতে হিন্দুস্তান থেকে ৭৭১ খ্রিস্টাব্দে জ্যোতির্বিদ্যার গ্রন্থ আসে এবং সেটিকে আরব ভাষায় তর্জমা করেন মহম্মদ ইবন ইব্রাহিম আল-ফারাজি (৭৯৬-৮০৬) আর এরই ভিত্তিতে বিখ্যাত আল- খোওয়ারিজ্মি (আনুমানিক ৮৫০) তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক প্রামাণ্য গ্রন্থখানি রচনা করেন। রোম্যানদের স্বল্প সমর্থ সংখ্যাসূচক প্রতীকদরে স্থানচ্যুত করে বর্তমানে যে সংখ্যাসূচক প্রকৃষ্টতর প্রতীকতন্ত্র সর্বত্র প্রচলিত তাও আসে ভারত থেকে, এবং আরবদের সূত্রেই সেটি ইউরোপে পৌঁছয়। গণিতবিজ্ঞানে শূন্যের উদ্ভাবনা এবং দশমিক প্রথাও ভারত থেকে আরব মারফৎ অন্যত্র ছড়ায়।

বস্তুত আরব সভ্যতার ব্যাপক বিস্তারের ফলে একদিকে যেমন নানা সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান এই নির্মীয়মান সভ্যতার অন্তর্ভূক্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে আরবদের মনস্বিতার যা কিছু শ্রেষ্ঠকীর্তি তাও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেইন দখলের পর ইয়োরোপে সম্ভবত প্রথম বিিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আরবরা সেখানে তাদের রাজধানী কার্ডাভা নগরে। সে বিিবিদ্যালয়ের স্থাপত্য, পরিকল্পনা, গ্রন্থাগার এবং বিদ্যাচর্চার বিবরণ পড়লে এখনো তাজ্জব লাগে। এই বিিবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা খালিফ তৃতীয় আবদুল রহমানের রাজত্বকালে (৯১২-৯৬১) আরবশাসিত স্পেইন ছিল ইউরোপের সভ্যতম অঞ্চল। কর্ডোভায় লক্ষাধিক অট্টালিকা, বাঁধানো আলোকিত পথঘাট, নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রাচুর্য, বিিবিদ্যালয়ের গ্রন্থগারে চার লক্ষের বেশি পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ, কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি আরব স্পেনকে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছিল। আরব সভ্যতার এই স্বর্ণ যুগে দর্শন ইতিহাস, গণিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্মবিচার এবং ধর্মনিরপেক্ষ সহিত্যচর্চা, শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন-কানুন এবং নগর-সংগঠন-- প্রতি ক্ষেত্রেই বিবুধানদের উৎকর্ষ শুধু ইসলামের নয় খ্রিস্টধর্মীয়দের জগতেও অনেকখানি স্বীকৃতি লাভ করে। আল- রাজি (যাঁর চিকিৎসা এবং রসায়ন বিষয়ক দুটি গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ পঞ্চদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে এই দুটি বিষয়ে জ্ঞানের মুখ্য

উৎস বলে পরিগণিত হত); আলি ইব্নন্ - হাজ্ম্ (যিনি তুলনামূলক ধর্মবিচারে প্রবর্তক); ইব্ন-সিনা বা আভিসেনা (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকের মধ্যে যাঁর রচিত বিশ্বকোষের পনেরটি লাতিন সংস্করণ প্রকাশিত হয়) ; ইব্ন্-শ্দ্ বা আভেরোএ (যাঁর রচনার মারফৎ আরিস্টাললের দর্শন এবং যুক্তিবাদ ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে); টিউনিশ - এর বহুবিদ্যা প্রতিভা ইব্ন্ খালদুল (যাঁর মহাগ্রন্থ 'মুকাদ্দিমা'য় তিনি যে সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাস-দর্শনের পরিলেখ রচনা করেন তার মৌলিকতা এবং আধুনিকতা বিস্ময়কর--- বস্তুত তাঁর পূর্বে কোনো দেশে বা কোনো ভাষাতেই বৈশ্বিক ইতিহাস এভাবে ভৌগোলিক অবস্থান, রাষ্ট্রিক-আর্থিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে কল্পিত হয় নি), -- আরব স্বর্ণযুগের এই প্রতিভ বিদ্যাবিশারদের তালিকায় আরো অনেক নামই যোগ করা চলে। ইব্ন্ আল আরাবি, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইব্ন্ আল্-আত্তয়াম্, কিতার আল্ আফগানির কবি আবু আল ফারাজ ইসফাহানি, কবি আল মালি, গদ্যশিল্পী আল- জাহিজু, গ্রীকদশনের আরবি তর্জমাকার মহাপণ্ডিত হুনাইন বিন ইশাক, দার্শনিক ইব্ন্ তুফাইল, দার্শনিক ইয়াকুব আল-কিন্দি, গাণিতশাস্ত্রী আল - খোওয়ারিজমি (ভারতীয় গণনাপদ্ধতি যাঁর আরবি অনুবাদের লাতিন অনুবাদ মারফৎ ইয়োরোপে প্রচার লাভ করে), গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিজ্ঞানী আল-হাইথাম (বা আলহাজেন), চিকিৎসা - বিজ্ঞানী ইশহাক আল-ইবদি, যন্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গম আর- রাজ্‌জাজা আল-জামারি--তালিকা বাড়াবার দরকার দেখি না। যেটা স্পষ্ট, মহম্মদের মৃত্যুর পর তিন মহাদেশব্যাপী যে আরব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, ইসলাম তার উৎস হলেও তার উৎকর্ষ ধর্মীয় মৌলবাদে আবদ্ধ না থেকে জিজ্ঞাসা এবং সৃষ্টির বিচিত্র ক্ষেত্রে অর্জিত হয়েছিল। শুধু জ্ঞানের চর্চা নয়, স্থাপত্য, চিত্রকলা, বিবিধ চাশিল্পের বিকশিত সম্পদে এই সভ্যতা ছিল অনেকটাই ইহমুখী। এবং সবটাই স্বর্ণযুগ না হলেও, এই সভ্যতা টিকেছিল প্রায় পাঁচ / ছশো বছর।

।। তিন ।।

এখন চিবান নৃপতিদের এবং বিস্তারশীল বাজারের আকর্ষণে শুধু আমেল, বহুবেত্তা, ব্যবসায়ী এবং কারিগররাই রাজধানীতে এসে ভীড় করেন না; যারা গল্পে আড্ডাবাজ, জমাটি কাহিনী শুনিয়ে যারা হাটবাজারে মানুষ টানতে পারেন তাঁরাও সেখানে যথারীতি হাজির হন। তাঁদের মুখে মুখে চলে আসে দূর দূর দেশের নানা কিস্‌সা, আর এক মুখ থেকে অন্য মুখে চলতে চলতে তাদের চেহারা চরিত্রে নানা ওলট-পালট হয়। বাঘ্দাদের প্রাসাদে-বাজারে, গেরস্থেরঘরে এবং সরকারি দফতরে, বিভিন্ন পট্টিতে, ব্যারাকে এই সব কিসসা কাহিনী জমা হয় আর ছড়িয়ে যায়। অসংখ্য দেবদেবীর মত অগণিত উদ্ভট কাহিনীর অফুরাণ উৎস হিন্দুস্তান থেকে সূক্ষ্ম সুমার্জিত মহাচিন। সুপ্রাচীন মিশর থেকেসূদূর কাস্পিয়ান, নবীন কর্ডোভা থেকে বৈচিত্রচিহিত কনস্টান্টিনোপল-- সব জায়গা থেকেই গল্পে স্ত্রীপুষ নানা ধরনের গল্প নিয়ে এখানে হাজির হন। আর এইভাবেই ত্রমে ত্রমে ওঠে আরব্যরজনীর বিচিত্রস্বাদী কাহিনী সংকলন।

আলফ্ লায়লা ওয়া-লায়লা বা হাজার এবং এক কোনো একজনের লেখা নয়, কোনো এক নির্দিষ্ট কালে লেখা হয় নি। এই মহাগ্রন্থের একক রচয়িতা হিসেবে বাল্মীকি, কি বেদব্যা সবা হোমার জাতীয় কোনো ব্যক্তিকে কল্পনা করা হয় নি। ৯৫৬ সালে মাসুদি নামে একজনের গ্রন্থে "হাজার আফসানা"(হাজার গল্প) নামে একটি সংকলনের উল্লেখদেখা যায় ; সংকলনটি পারস্যের ভাষায় লেখা, এবং তাতে প্রধান উজীর, তার কন্যা শিরাজাদ এবং তার দাসী ওসখি দিনাজাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারপর ৯৮৫ সালে বাঘ্দাদে এক আরব পণ্ডিত একটি বিরাট পুঁথি-তালিকা প্রস্তুত করেন; এটিতে যেসব বইয়ের কিছুটা বিস্তারিত পরিচিতি আছে "হাজার আফসানা" তার মধ্যে একটি । এখানে লেখা হয়েছে যে এইসব কাহিনীর মধ্যে অনেকগুলিই নাকি বিশ্ববিজয়ী বীর আলেকজান্দারের সময়ে রাতের বেলা তাঁর রণশ্রান্ত সৈন্যদের শোনানো হত। আলেকজান্দার শুনতেন কিনা বলা শক্ত, তবে এই বিবরন থেকে যেটা স্পষ্টসেটা হল, নানা দেশের নানা রকমের এই গল্পগুলিকে "হাজার আফসানা"য় ইতিমধ্যেই একটি সুতোয় গাঁথা হয়েছে, আর সে সুতোটি হল শাহ্‌রিয়ার-শাহ্‌রাজাদ আর দুনিয়াজাদের মূল কাহিনী। বেগমের ব্যাভিচারিতা প্রত্যক্ষকরে শাহ্‌রিয়ার যদি না সিদ্ধান্ত করতেন যে প্রতি রাতে তিনি একটি করে শাদী করে পরদিন সেই মেয়েটির মাথা কেটেফেলার হুকুম দেবেন; উজিরের দুই চতুরা কন্যা শাহ্‌রাজাদ আর দুনিয়াজাদ যদি শলা পরামর্শ করে না ঠিক করতেন যে রাতের পর রাত একটির পর একটি করে নতুন গল্প অসমাপ্ত রেখে তাঁরা নিজেদের (এবং ভবিষ্যতে অন্য মেয়েদের) জান বাঁচাবেন; আর শাহ্‌রিয়ার যদি কিস্‌সা শুনতে শুনতে বুঁদ না

হয়ে যেতেন (আধুনিক উপন্যাসের নায়ক হলে তাঁর পক্ষে কিছুটা পরেই নাক ডাকিয়ে ঘুমোনো একেবারে অসম্ভব ছিল না), তাহলে এইসব নানাদেশ থেকেআমদানি আসলিমাল কিস্‌সাগুলি একটি বিরাট মালায় এভাবে গাঁথা হত না। গল্পগাথার এই রীতি এবং একটি গল্পের মধ্যে আরো আরো গল্প ঢুকিয়ে দেওয়া যে বুদ্ধি চাতুর্য, পণ্ডিতদের মতে সে দুটিও নাকি সুদূর হিন্দুস্তান থেকেই পাওয়া।

যে গ্রন্থ তালিকার উল্লেখ করেছি সেটি অনুসারে "হাজার আফসানা" নাম হলেও তালিকায় উল্লেখের সময়ে ঐ পুঁথিতে পুরো দুশোটি গল্পও ছিল না। তালিকাকারদের প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ৯৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে আবু আবদুল্লাহ্ মহম্মদ গ্রীক, ভারতীয়, আরব, পারস্য নানা সূত্র থেকে মুখে মুখে চলতি আরো নানা গল্প সংগ্রহ করেন। মুখে আরব ভাষা ও লিখিত আরব ভাষার মধ্যে ব্যবধান--অর্থাৎ diglossa-ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কিন্তু আরবদের ভিতরে মুখে মুখে গল্প গড়া এবং বলার ঐতিহ্য উনিশ শতকেও প্রবল ছিল। তাদের ইতিহাসের এবং কল্পনার যারা বীরপুষ তাদের নিয়ে রচিত কথা ও কাহিনীর অন্ত ছিল না। এই কাব্যকাহিনীদের বলা হত সিরা। এবং এডওয়ার্ড লেনের বর্ণনা থেকে জানি ঊনিশ শতকে কায়রোতে পেশাদার কথকদের মুখে"বানি হিলাল""সিরাত বায়বার্স্"এবং"সিরাত অন্তর"-এর কাহিনী শুনতে শ্রোতার অভাব হত না। অর্থাৎ আরো বেশ কিছু মৌখিক মালমশলা হাটেবাজারে ছড়িয়ে ছিল, স্থায়ী সাহিত্যের রূপ পেতে কিছুটা সময় লেগেছে। আবদুল্লাহ্ মহম্মদ মৌখিক উৎসকে অবহেলা করেন নি। কিন্তুহাজার গল্প সংকলনের উৎকাঙক্ষা থাকলেও তিনিও শেষ পর্যন্ত ৪৮০ টি কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন।

তবে এটা সবাই স্বীকার করেন যে আলফ্ লায়লা ওয়া-লায়লার মূল উৎস হল ঐ পারস্য ভাষায় রচিত সংকলন হাজার আফ্সানা। তাতে এসে মিশেছে--গ্রীক, হিব্রু, মিশর, পারস্য ভারত নানা দেশের নানা লোককাহিনীর ধারা। পার্শি থেকে আরবিতে অনুবাদের আদি খসড়া যিনি তৈরি করেছিলেন হিট্টির মতে তাঁর নাম আল-জাহ্শিয়ারি। ত্রমে এই সংকলনে যে সব গল্প স্থান পায় তাদের ভিতর স্পষ্টই তিন রকমের চারিত্রিক চোখে পড়ে। যেগুলি বাঘ্দাদ থেকে আহৃত সেগুলিতে প্রেম, রোমান্স, বীরত্ব ইত্যাদি বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যেগুলি কিছুটা পরে কায়রো থেকে আমদানি সেগগুলিতে ব্যঙ্গ -রসিকতার সঙ্গে অতিপ্রাকৃতিক কাণ্ডকারখানার মিশাল চোখে পড়ে। আর পারস্য এবং ভারতের কাহিনীগুলিতে বুনটের সূক্ষ্মতা বেশি, তাছাড়া কল্পনার সঙ্গে নীতিশিক্ষার কিছুটা মিশ্রণ আছে। আলফ লায়লা-তে বেশ কয়েকটি বিখ্যাতো এবং জনপ্রিয় অল্প আছে যা "হাজার আফসানায়" ছিল না --বস্তুত এদের মধ্যে কিছু কিছু গল্প মৌখিক উৎস থেকে জোগাড় করে এদের প্রথম পশ্চিমী অনুবাদ এই সংকলনের অন্তভূক্ত করেন-- যেমন আলিবা, আলাদিন এবং সিন্দবাদের কিছু কিছু কাহিনী।

আলফ্ লায়লার আদি আরবি খসড়া আববাসিদদের যুগেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু তার যেটি সাহিত্যিক এবং সাধারণস্বীকৃত রূপ সেটি আকার নেয় ইজিপ্তে মামলুক বংশের রাজত্বকালে (১২৪৯-১৩৯০)। ঐ সময়ে কায়রো আরব সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বস্তুত ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোলরা বাঘ্দাদ দখল করবার পর ইসলাম সভ্যতা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে টিকে থাকে। প্রথমটি অটোমান তুর্কিদের, দ্বিতীয়টি পারস্যে সাফউইদদের। আর তৃতীয়টি ভারতে মোগলদের। ফলে আলফ্ লায়লাতে কোথাও বাঘ্দিাদের চাইতে কায়রোর স্বাদ বেশি স্পষ্ট। ইসলামের স্বর্ণযুগে দক্ষিণ ইউরোপের বেশি খানিকটা তার অন্তর্ভূক্ত করেছিল সে সময়ে আরব দর্শন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে এই সব কথাকাহিনীও ইউরোপে ছড়ায়। রেনেসাঁস এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সাহিত্যে তার কিছু কিছু প্রভাব চোখে পড়ে। চসারের ক্যান্টরবেরি টেলস-এ এবং বোকাচিচও দেকামেরনে বিভিন্ন গল্প নিপুণ হাতে গেঁথে যে বহুনরীর কাহিনীমালা গড়ার কেরামতি দেখি সম্ভবত তার সচেতন মডেল হাজার আফ্সানা বা আলফ্ লায়লা ওয়া-লায়লা।

তবে আলফ্ লায়লার ইউরোপীয় ভাষায় প্রথম তর্জর্জমা হয় ফ্রাঁন্সে। ১৭০৪ থেকে ১৭১৭--এই চৌদ্দ বছর ধরে আঁতোয়ান গালাঁদ নামে এক পণ্ডিত ছোট ছোট আকারে বারোটি খণ্ডে ফরাসী ভাষায় তাঁর এই অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং তা অবিলম্বে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গালাঁদ নিজে ছিলেন নিপুণ কথাকার, এবং তর্জমা করতে গিয়ে প্রয়োজন মা

ফিক স্বাধীনতা দিতে সংকোচ করেন নি। বস্তুত তাঁর সময়ে সাধারণ পাঠক এই কাহিনীগুলিকে “মঁসিয় গালাঁদের গল্পসিরিজ” বলেই মনে করত। --ভলত্যের থেকে শু করে আঠারো শতকের অনেক ছোটবড় লেখক সাহিত্যিকই এই গল্পগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন।

জনপ্রিয়তার ফলে এবং গ্রন্থসত্বের কোনো প্র না থাকার ফলে আলফ্ লায়লার বিকৃত নানা সংস্করণে বাজার ছেয়ে যায়। পরে পণ্ডিতরা ভিন্ন ভিন্ন পুঁথির কপি ও সংস্করণ তুলনা এবং বিচার করে যে প্রামাণিক আরব সংস্করণ সম্পাদনা করেন সেটি ১৮৩৫-৬৩ সালের মধ্যে বুলাক্ সংস্করণ নামে মূদ্রিত ওপ্রকাশিত হয়। তারপর ইংরেজিতে এই মহাগ্রন্থের অনেকগুলি অনুবাদ সংস্করণ বেরোয়। তাদের ভিতরে গোড়ার দিকে বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য অনুবাদ গ্রন্থটি ১৮৪৯ সালে তিন খণ্ডে মুদ্রিত হয় -- অনুবাদ করেন ওডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন, কাহিনীগুলির চিত্রাঙ্কন করেন ই. এস. পুল। পণ্ডিতদের মতে সব চাইতে মূলানুগ অনুবাদটি জন পেইন-এর করা--এটি নয় খণ্ডে লন্ডন থেকে ১৮২৮-৪ এ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে কিন্তু কোনো টীকা বা ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। তবে য়ে সংস্করণটি সব চাইতে প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয়-- এটিতে টীকা - ব্যাখ্যা আছে -- সেটির তর্জমাকার রহস্যমণ্ডিত বহুবিদ্য অ্যাডভেঞ্চারর স্যর রিচার্ড বার্টন। লন্ডন থেকে এটির প্রকাশক না মেলায় বার্টন এটি প্রকাশ করেন বেনারস থেকে ১৮৮৫-৮৮ সালে, ষোল খণ্ডে। এটির অনেকগুলি পুনর্মুর্দ্রণ এবং সংস্করণ হয়েছে--- কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সেটটি বর্তমানে খুবই দুর্লভ। অধিকাংশ সংস্করণেই কিছু কিছু গল্প বেছে নিয়ে সাধারণ পাঠক-পাঠিকার ব্যবহারযোগ্য রূপ দেওয়া হয়েছে। বিভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থগারে শুনেছি প্রথম চৌধুরী সংগ্রহে মূল সেট - এর কপি আছে--আমার দেখবার সৌভাগ্য হয় নি।

।। চার ।।

এ সবই আরব্য - রজনীর পূর্বকথা। উত্তরকথা লেখবার অভিলাষ সত্ত্বেও সময়াভাবে এবং অন্য কাজের চাপে সে চেষ্টা ভবিষ্যতের জন্য তোলা রইলো। আপাতত এ প্রসঙ্গে গুটি তিনেক ব্যাপারের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে এ আলোচনায় ইতি টানব।

প্রথমত, আরব জানুন বা না জানুন মুসলমান মাত্রেরই চরম অথরিটি কোরান, ফলে এটিই ইসলাম জগতের সব চাইতে পরিজ্ঞাত এবং মান্য গ্রন্থ। অপরপক্ষে গোঁড়া মুসলমানরা আগাগোড়াই আরব্য-উপন্যাসকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখে এসেছেন, এবং পশ্চিমে এই গ্রন্থ নিয়ে বিস্তর আলোচনার ফলেই মুসলিম আলেমরা সম্প্রতিকালে এটিকেআরব লোকসাহিত্যের একটি উৎস হিসাবে বিবেচনা করতে শু করেছেন। আরব্য - উপন্যাস আর যাই হোক রামায়ণ মহাভারতের মত ধর্মগ্রন্থ নয়। বস্তুত যাঁরা মুসলমান নন তেমন পাঠক পাঠিকাদের কাছেই আলফ্ ওয়া-লায়লারজনপ্রিয়তা অনেক বেশি। স্রেফ সাহিত্য হিসেবেই যে গ্রন্থ পৃথিবীর অন্য সব ক্লাসিকদের সমতুল্য এটি বুঝতে হলে ধর্মবুদ্ধির চাইতে সাহিত্যবোধ প্রখরতর হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় কথাটি প্রথমটির সঙ্গে আংশিকভাবে জড়িত। আলঙ্কারিকরা যে নবররসের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে সব কটিরই স্বাদ আলফ্ লায়লাতে পাওয়া যায় বটে, তরে যেটিকে আদিরস বলা হিয় সেটিই এই কাহিনীগুলির বিশেষ আকর্ষণ। এখন শ্রীপুযের যেটি আদি বৃত্তি--কাম- সেটিতে খাঁকতি ঘটলে শুধু ব্যক্তির জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে না, প্রজাতির কপালেও ফাটল ধরে। অথচ কাম বড় সাংঘাতিক বৃত্তি - সব কিছু ভেঙে, ভাসিয়ে, উপপ্লব ঘটাতে পারে। ফলে এই বৃত্তি নিয়ে সমাজকর্তাদের যেমন দুর্ভাবনা, এটি শুদ্ধ করে প্রেমে রূপান্তরিত করবার জন্য শিল্পীদের ওপরেও তেমনি প্রবল তাগাদা। হিন্দুদের পুরাণ কাহিনীতে মেনকা-উর্বশীদের দেখলেই যেমন মুনিঋষিদের কথায় কথায় রেতঃ পাত হত, আর সেই রেতের ঠ্যালা সামলাতে হতো বনের হরিণ, আকাশের পাখি আর জলের মাছকে, আরব্য উপন্যাসের চরিত্ররা ঠিক ততটা অসংযমী এবং বেহিসেবী না হলেও কামশাস্ত্রে তাঁরা নেহাৎ দরকাঁচাও ছিলেন না। ফলে যেমন মহাভারত তেমনি আলফ্ লায়লা শিশুপাঠ্য কিতাব নয়। মহারাণী ভিক্তোরিয়ার যুগে আরব্য-উপন্যাসের অনেক শিশুপাঠ্য সংস্করণ বার হয়। বলাই

বাহুল্য মহাভারতের মত আলফ্ লায়লার মস্ত গুণ তার অনেক গল্পেই এমন যাদু আছে যে কাটাছাঁটের পরও যথেষ্ট অ াকর্ষণ থেকে যায়। আলফ্ লায়লার নির্ভরযোগ্য পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ বেরিয়েছে বলে জানি না। তবে যাঁরা যত্ন নিয়ে পেইন ব া বার্টনের অনুবাদ পড়বেন তাঁদের স্বীকার করতেই হবে এটি বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। অতিনৈতিক গুরুস্থানীয়দের নিষেধ অমান্য করে যেমন আমরা "দেকামেরন" পড়ি, এটিও সেভাবেই অবশ্যপাঠ্য।

আর তৃতীয় কথাটি এই মহাগ্রন্থটি থেকে কী শিক্ষা পাই তা নিয়ে। চমকাবার প্রয়োজন নেই, সাহিত্যে নীতিকথা খোঁজ অ ামার স্বভাব নয়। কিন্তু আলফ্ লায়লা পড়ে প্রথমেই আমার মনে হয়েছে পুরুষরচিত প্রায় সব কিস্‌সার-ই মূলকথা, স্ত্রীলে াকের সতীত্বে বিশ্বাস করা যায় না, তারা সুযোগ পেলেই পরপুরুষ সম্ভোগ করতে চায়। তাই দরকার তাদের জন্য চরম শা স্তি বিধান। এ ব্যাপারে শাহ্‌রিয়ার আর গৌতম মুনি প্রায় সহমত---একজন বিশ্বাসঘাতিনীর গলা কাটেন, অন্যজন তাকে প্রস্তরীভূত করেন। কিন্তু তারপরেই আলফঁ লায়লাতে যেন একটা নতুন সুরের আভাস পাই।শিল্পের চাতুর্যে মতিবিভ্রংশের সুস্থতা ঘটানো সম্ভব। শাহ্‌রাজাদের অফুরন্ত গল্পের সঞ্চয়, এবং সেই সঞ্চয় থেকে একটির পর একটি বার করে অসুস্থজনের দাওয়াই-এর মত আধখানা করে শোনানো--এ যে কী পাকা শিল্পী-চিকিৎসকের কাজ তা অনুমান করে মুগ্ধ বোধ করি। কী শক্তি এই শিল্পের যা শুধু শাহ্‌রাজাদ আর দুনিয়াজাদাকে রাতেরর রাত প্রভাতে মৃত্যুর অনিবার্যতা থেকে রক্ষা করে নি, যা শুধু দেশের অন্য মেয়েদেরও শেষ পর্যন্ত চরম শাস্তি থেকেবাঁচায় নি, যা ক্রোধান্ধ, অভিতাপিত, আক্রে াশপরায়ণ শাহ্‌রিয়ারকে শেষ পর্যন্ত ব্যাধিমুক্ত করে। রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনে। ক্রুশবহন করে যীশু অত্যাচারীর হৃদয় জয় করতে পারেন নি। ভারতে সযত্নে পুষে রাখা বিদ্বেষ বিষ গান্ধির অহিংস অসহযোগের ফলে যে কিঞ্চিৎমাত্র হ্রাস পেয়েছে এই দীর্ঘ জীবনে তার প্রমাণ পাই নি। যদি শিল্পিত কাহিনীর নিয়মিত দাওয়াই প্রয়োগ করে দুই কুশাগ্রবুদ্ধি উজির কন্যা নিষ্ঠুর শাহ্‌রিয়ারের বুদ্ধিবৈকল্য সারিয়ে থাকেন, তবে তার জন্য তারিফ শুধু তাঁদের নয়, শিল্পের পক্ষেও পাওয়া সঙ্গত। আলেকজান্দারের সৈন্যরা নানা ধরনের কিস্‌সা শুনে কী ধরনের আনন্দ পেত জানি না, কিন্তু আলফ্ লায়লা শুধু বিভ্রান্ত শাহ্‌রিয়ারের নয়, আমারো নানাভাবে বোধোদয় ঘটিয়েছে। চারদিক থেকে কখন ধর্মোন্মাদ এবং শক্তি-উন্মদদের হুংকার শুনি, যখন সমাজজীবনে এবং স্বজনপরিবেশে সুস্থ প্রতিন্যাসের আভাস পাই না, তখনও প্রেম এবং শিল্প আমার মনে প্রজাতিক ভবিষ্যতের আশ্বাস জাগিয়ে রাখে। আরব্য-রজনী এই আশ্বাসমন্ত্রের একটি।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com